পাঠ্যবই নিয়ে যা হচ্ছে, তা আমাদের ভাবনায় ফেলছে

সফিক চৌধুরী
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

উৎসব হোক বা না হোক বছরের শুরুতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়া বিরাট আনন্দদায়ক ব্যাপার। বছরের পর বছর আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নানা অসংগতি ও গলদ থাকা সত্ত্বেও ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি উৎসব আয়োজন করে প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিক স্তরেও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু প্রায় প্রতিবছর জানুয়ারির শুরুতে যে খবর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আশাহত করে, সেটি হলো সঠিক সময়ে বই হাতে না পাওয়া, সব বই একসঙ্গে না পাওয়া, ভুলে ভরা ও বইয়ের নিম্নমান। পাঠ্যবই প্রণয়নের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ওপর। দুঃখজনক বিষয় হলো, পাঠ্যবই নিয়ে মূলধারার সংবাদমাধ্যম, নাগরিক সমাজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনা-বিতর্ক শুরু হওয়ার পরই কেবল এ বিষয়ে তাদের (এনসিটিবি) হুঁশ হয়, তার আগে পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠলেও তারা থাকে নিশ্চল, নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে কিছু বিবৃতি এবং আশ্বাস দিয়ে দায় সারে।

চলতি বছরের শুরুতে দুই মাস পেরিয়ে গেলেও শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের সব পাঠ্যপুস্তক তুলে দিতে পারেনি বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। স্বাভাবিকভাবেই বছরের শুরুতেই ব্যাহত হয়েছে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন। বই না পেয়ে বাধ্য হয়েই কিছু অভিভাবক যাদের সামর্থ্য ছিল তারা ইন্টারনেট থেকে পিডিএফ কপি প্রিন্ট নিয়ে পড়িয়েছেন,

কেউ বা চড়া দামে বাজার থেকে পিডিএফ থেকে ছাপানো বই কিনতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু শহরের বিদ্যালয়ে পাঠদানের যে সুযোগ সেটি মফস্বল বা একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনেক সংকুচিত। কারণ সেখানে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও সহজলভ্যতা সীমিত। ফলে অভিভাবকদের বড় একটি অংশ যাদের সামর্থ্য ছিল না তারা বই না পেয়ে সন্তানের পড়াশোনায় অনেকটাই পিছিয়েছেন, এতে বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়াশোনায় চরম বৈষম্যেরও সৃষ্টি হয়েছে।

অস্বীকার করার উপায় নেই, শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া রীতিমতো বিশাল এক চ্যালেঞ্জ। চলতি শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এমন অব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বহীনতার কারণে আমাদের প্রত্যাশা ছিল, আগামী শিক্ষাবর্ষের আগেই সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে। চলতি বছরের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে এবার বই ছাপানোর কাজের প্রক্রিয়াও আগেভাগেই শুরু করেছিল এনসিটিবি। নভেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপিয়ে মাঠপর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যও ছিল। কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ভাষ্যে জানা যায়, শেষ সময়ে এসে ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে বই ছাপানোর ক্ষেত্রে দরপত্রে (টেন্ডার) অনিয়মের কারণে মাধ্যমিকের তিন শ্রেণির (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম) পাঠ্যবইয়ের দরপত্র বাতিল হয়ে যাওয়ায় পুরো পরিকল্পনাটিই এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। পত্রিকার তথ্যমতে, ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়ের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৩ লাখ ২১ হাজার ৯০৬, সপ্তম শ্রেণির ৪ কোটি ১৫ লাখ ৮৪ হাজার ৬৯২ এবং অষ্টম শ্রেণির ৪ কোটি ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬৯৮। এর মধ্যে ২৮০টি লটের মধ্যে ১১ কোটির বেশি বই ছাপানোর দরপত্র বাতিল হয়েছে। কিন্তু যেসব অনিয়মের কারণে দরপত্র বাতিল করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে তেমন কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ফের একই নিয়মে দরপত্র আহ্বান করেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এর ফলে আগামী জানুয়ারিতে মাধ্যমিকের সব শিক্ষার্থীর হাতে সব বই তুলে দেওয়া সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে এনসিটিবির কর্মকর্তারাই নিশ্চিত নন। তাদের মতে, এখন নতুন দরপত্রের মাধ্যমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম এই তিন শ্রেণির পাঠ্যবই ছাপাতে প্রায় পাঁচ মাস সময় লাগতে পারে। তবে এটি আদর্শিক হিসাব। বাস্তবে সব সময় পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোয় না। নভেম্বরে-ডিসেম্বরে মুদ্রণকারীরা নোট-গাইড ছাপানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে ছাপাখানার কাজও বাড়বে বহুগুণ। সব মিলিয়ে জানুয়ারির শুরুতে সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। যদিও এনসিটিবির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক রবিউল কবীর চৌধুরী বলেছেন, 'তারা আশা করছেন, যথাসময়েই শিক্ষার্থীদের হাতে বই দিতে পারবেন' (৩ সেপ্টেম্বর, দৈনিক প্রথম আলো)। কিন্তু প্রশ্ন এসে যায়, একেবারে প্রায় শেষ সময়ে তাড়াহুড়ো করে ছাপানো সেই বইয়ের ছাপা কি মানসম্মত হবে? আমরা দেখেছি, প্রতিবার শেষ মুহূর্তে তড়িঘড়ি করে বই ছাপা ও সরবরাহ করতে গিয়ে ন্যূনতম মানও রক্ষা করা যায় না। অনেক সময় ছাপা অস্পষ্ট থাকে, প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশি কালি দেওয়া হয়, কাগজের মানও থাকে খারাপ। এত সব খারাপ নিয়ে যে বই শিক্ষার্থীরা হাতে পায়, তা সারা বছর রাখার মতো মানসম্পন্ন হয় না। অবশ্য পত্রিকার তথ্যমতে, প্রাক্?-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণির বই ছাপানোর প্রক্রিয়া এগিয়েছে অনেকটাই।

আমরা দেখছি, পাঠ্যবই নিয়ে প্রায় প্রতিবছরই একই অজুহাত, একই অব্যবস্থাপনা, একই ব্যর্থতার গল্প! কখনও বিতরণ নিয়ে, কখনও বা নানা ভুল নিয়ে, কখনও ছাপা বইয়ের নিম্নমান নিয়ে। ব্যর্থতার এই গল্পের দ্রুত কার্যকর সমাধান না নিলে এই ব্যর্থতা কেবল বছর ঘুরেই আসবে না; বরং এটি রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতারও প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। প্রায় প্রতিবছর পাঠ্যবই ছাপা হয়ে সেগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণের পর ভুল-ত্রুটি, অস্পষ্টতা ও নানা অসংগতি ধরা পড়লে সরকার পরবর্তী সময়ে 'সংশোধনী' দিয়ে মনে করে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল- কিন্তু এভাবে বছরের পর বছর এমন অব্যবস্থা আর নৈরাজ্য চলতে দেওয়া যায় না। এর জন্য সরকারের যথাযথ নজরদারি ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে দ্রুতই।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের অন্যান্য অনেক খাতের মতো শিক্ষা খাতেও একটি দুষ্টচক্র আছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী আমরা আশা করেছিলাম, শিক্ষা খাতে বিগত সময়ের অনেক অব্যবস্থাপনা ও নৈরাজ্যের ইতি ঘটবে, বিশেষ করে শিক্ষা ঘিরে কর্মপরিকল্পনা ও ব্যাপক সংস্কার হবে, যদিও তার কিছুই তেমন ঘটেনি। ফলে একটা অদৃশ্য দুষ্টচক্রের কাছে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা এক প্রকার জিম্মিই বলা চলে। শিক্ষা খাতে বিশেষ করে বই ছাপানো ও বিতরণ নিয়ে যে কোনো নৈরাজ্য অবসানে কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগ ও নজরদারি জরুরি।

যাদের কারণে বই মুদ্রণ ও বিতরণে দেরি হওয়ার আশঙ্কা আছে, এখনই তাদের যথাযথ জবাবদিহির আওতায় আনা দরকার। সরকার চাইলে শিক্ষার্থীদের হাতে সঠিক সময়ে বই পৌঁছে দেওয়ার কাজটি সুচারুভাবে বছরের শুরুতেই সম্পন্ন করা মোটেই কঠিন কিছু নয়। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে বছরের শুরুতেই যদি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় হারিয়ে যায় তার দায়ভার কে নেবে? শিক্ষার্থীদের হাতে নির্ভুল-মানসম্মত বই সময়মতো পৌঁছে দিতে কর্তৃপক্ষকে পেশাদারি ও আন্তরিকতার পরিচয় দিতেই হবে, এর কোনো ব্যত্যয় হতে পারে না।

বিগত বছর জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, পাঠ্যবই ছাপার পুরো কাজটি তারা দেশি মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই করবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বাঁচবে, তেমনি দেশি মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিকভাবেও লাভবান হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পাঠ্যবই ছাপার কার্যাদেশ দিতে অহেতুক দেরি করার ফলে মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো তাড়াহুড়া করে যে বই ছাপে, তা হয়ে যায় অনেকটাই নিম্নমানের। তাই ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে কার্যাদেশ দেবে এবং মুদ্রণপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাপা ও কাগজের মানোন্নয়নের বিষয়ে অধিক যত্নশীল হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারেও কঠোর নজরদারি করবে- এই প্রত্যাশা আমাদের সবার। প্রতিটি বই ছাপার পর নমুনা কপি পরীক্ষা করার নিয়ম আছে। সেই নিয়ম মানা হচ্ছে কিনা অথবা যাদের ওপর পরীক্ষা করার দায়িত্ব, তারা সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন কিনা সেটাও দেখা জরুরি।

অন্যদিকে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, দীর্ঘ প্রায় বছর আড়াই ধরে নানা বিতর্কে আটকে থাকার পর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আইন সংশোধন করে আগামীতে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই এনসিটিবির পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মুদ্রণ ও বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ছড়িয়ে থাকা নানা সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কেন বই ছাপানোর দায়িত্ব নিতে বিশেষভাবে আগ্রহী তা আলোচনার দাবি রাখে।

সে যাই হোক, শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সময়মতো বই না পেলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় স্বাভাবিকভাবেই ব্যাঘাত ঘটবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই বা কী পড়াবেন? এতে বাজারের সহায়ক গাইড বইয়ের ওপর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আরও বেশি ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকি বাড়বে, যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী কারও জন্যই মঙ্গলজনক নয়। চলতি শিক্ষাবর্ষের অভিজ্ঞতায় ওয়েবসাইটে পাঠ্যবইয়ের অনলাইন ভার্সন দেওয়া হলেও এটি সারাদেশের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কতটা কাজে লাগাতে পারবেন, সেই প্রশ্নও থেকে যায়। অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশের বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর সুযোগও নেই। তাই সরকারের কার্যাবলিতে অন্যতম অগ্রাধিকার দিয়ে শতভাগ নির্ভুল পাঠ্যবই প্রণয়ন, মানসম্পন্ন মুদ্রণ ও সঠিক সময়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

সফিক চৌধুরী : কলাম লেখক ও বিশ্লেষক